# প্রাইমারী শিক্ষা নিয়ে দু'টি কথা

এস এস চাকমা

গত ১৮-২-৯৭ দৈনিক সংবাদ-এ একটি প্রতিবেদনে বের হয়েছে যে, বর্তমানে সারা দেশে ৫৬৯৩টি গ্রামে কোন প্রাইমারী স্কুল নেই। তাই সরকার আগামী ৫ বছরে ৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ২০ হাজার স্যাটেলাইট স্কুল তৈরি করবে। ঐ প্রতিবেদন হতে আরো জানা যায় যে, বর্তমানে দেশে সর্বমোট সরকারি প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ৩৮,৭১০ এবং বেসরকারি রেজিস্ট্রেশনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯,৬৮৪। এছাড়া রেজিস্ট্রেশনের অপেক্ষায় আরো ৫ হাজার প্রাইমারী বিদ্যালয় আছে।

১৯৯৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল, ক্ষমতায় গেলে আগামী দশ বছরের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। এ উদ্দেশ্যে সরকার ৫ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প তৈরি করেছে। প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি গ্রামে একটি করে নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সারা দেশে স্যাটেলাইট বিদ্যালয় স্থাপন। এছাড়া পুরনো বিদ্যালয় মেরামত ও আধুনিকায়ন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষক নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি। এই প্রকল্পের জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১৬০ কোটি মার্কিন ডলার অর্থাৎ বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশ্বব্যাংক সাহায্য দিতে রাজি হয়েছে, তবে ১৬০ কোটি ডলার নয়, মাত্র ৭০ কোটি ডলার এবং সেই সাথে শর্ত দিয়েছে যে, প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা বাড়ানো যাবে না। কারণ হিসেবে বিশ্বব্যাংক বলছে যে, ভবিষ্যতে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাবে। তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী শিশুর সংখ্যাও তুলনা-মূলকভাবে কমে যাবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, সারা দেশে ইতিমধ্যে ৫৬৯৩টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। তাই নতুন কোন বিদ্যালয় স্থাপন করা না হলে এসব গ্রামের ছেলেমেয়েরা কোথায় পড়বে? একারণে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে এসব গ্রামে অবশ্যই প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। বিশ্বব্যাংকের এই ব্যাপারটা ভেবে দেখা প্রয়োজন।

শুধুমাত্র বিদ্যালয় স্থাপন করলেই পড়াশুনার জন্য যথার্থ পরিবেশ আসে না। পড়ার পরিবেশ আনতে হলে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য চেয়ার- টেবিল, ব্ল্যাক বোর্ড, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের জন্য বেঞ্চ, বইপত্রের প্রাপ্তি ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। স্কুল ভবনও যে পাকা ভবন হতে হবে, তা অপরিহার্য নয়। এ প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলি, আমি যে প্রাইমারী স্কুলে পড়েছি তা ছিল একটি বেড়ার ঘর এবং উপরে ছিল ছনের ছাউনি। আমি যে বছর দ্বিতীয় শ্রেণী পাস করে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠি, সে বছর গ্রামবাসীরা স্কুলকে প্রাইমারীতে উন্নীত করে এবং এ কারণে স্কুলে আরো দুটো কামরা যুক্ত করা হয়। কামরাগুলো গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগেই তৈরি করে। আর স্কুলের ছেলেরা শিক্ষকসহ জঙ্গল থেকে বাঁশ কেটে নিয়ে এসে বসার জন্য বেঞ্চ তৈরি করে। সেই বেঞ্চে বসেই চতুর্থ শ্রেণী পাস করার পরে আমি পাশের গ্রামের মিড্ল ইংলিশ স্কুলে ভর্তি হই। এই স্কুলটিতে স্থান সংকুলান হতো না বলে কিছুদিন পর হেডমাস্টারের উদ্যোগে বিকেলে কিছুটা আগে ছুটি দিয়ে ছাত্র শিক্ষক সবাই মিলে ২/৩টি মাটির কামরা তৈরি করেছিলাম বলে এখনো আমার মনে পড়ে। আমাদের এ উদ্যোগে গ্রামবাসীরা ছাউনির জন্য ছন সরবরাহ করে। এভাবে ছাত্র-শিক্ষক অভিভাবকরা সবাই সম্পৃক্ত হওয়াতে আমাদের স্কুলটি তখনকার সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি অন্যতম সেরা স্কুলে পরিণত হয়।

যেহেতু বিশ্বব্যাংক প্রকল্প অনুযায়ী টাকা দিতে রাজি নয় এবং সরকারও দেশকে নিরক্ষরতা হতে মুক্ত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ, তাই আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমার মনে হয় যে, প্রাইমারী বিদ্যালয় স্থাপনে গ্রামবাসীদের সম্পৃক্ত করলে অনেক গ্রামবাসী বিদ্যালয় স্থাপনে এগিয়ে আসবে। আর সরকার যদি ঘোষণা দেয় যে, স্কুল ভবন নির্মাণ করা হলে সরকার ঐসব স্কুলের জন্য শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করবে তাহলে গ্রাম-বাসীদের মধ্যে যে উৎসাহের সৃষ্টি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ প্রসঙ্গে আমরা ভিয়েতনামের কথা উল্লেখ করতে পারি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ভিয়েতনামে গ্রামের লোকেরা স্কুল ভবন নির্মাণ করার পরে সরকার শিক্ষক নিয়োগ করত। এভাবেই ভিয়েতনাম বর্তমানে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়েছে। যার ফলে এখন ভিয়েতনামে সাক্ষরতার হার ৯১.৯%।

স্কুল ভবন নির্মাণ প্রসঙ্গে এ কথাটা বলা যায় যে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাকা ভবন নির্মাণ করা খুবই ব্যয়বহুল। দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার জন্য এখনো সব গ্রামে ইট, বালি, সিমেন্ট এবং অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রী ট্রাকে অথবা অন্যান্য যানবাহনে নেয়া সম্ভব নয়। এছাড়া যাতায়াত অসুবিধার জন্য ভবন নির্মাণের সময় যথাযথ তত্ত্বাবধান করাও সবসময় সম্ভব নয়। তাছাড়া নির্মাণ করার সময় মস্তানদের বখরা বা ঠিকাদারদের কম খরচে বেশি লাভ করার প্রবণতার জন্য অনেক সময় নির্মাণ ব্যয় অনেক বেড়ে যায়। এসব কারণে দূরবর্তী অঞ্চলে সাধারণত সরকারের নির্মাণকাজ খারাপ; কিন্তু ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। অনেক সময় দেখা যায় যে, ভবন হস্তান্তরের পরপরই মেরামতের প্রয়োজন হয় যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় হরহামেশ দেখা যায়।

এমতাবস্থায়, সরকার যেসব গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেসব গ্রামের অধিবাসীরা স্বল্প খরচে মাটির অথবা টিনের ঘর নির্মাণ করলে এতে সরকার শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ এবং শিক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করলে সরকারের শুধু কোটি কোটি টাকার সাশ্রয় হবে না, স্কুলের সাথে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়বে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্কুলে নিয়মিত যেতে বাধ্য হবেন। এখন তো শিক্ষক-শিক্ষিকারা নিয়মিত স্কুলে যাচ্ছেন কিনা তা দেখার দায়িত্বে থাকেন থানা শিক্ষা অধিকর্তা। কিন্তু তার পক্ষে থানার সব স্কুল নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। অনেক সময় যাতায়াত ব্যবস্থা অনুন্নত হলে পরিদর্শনে অনীহা দেখা যায়। তাই স্কুল ভবন নির্মাণে এবং স্কুল পরিচালনায় স্থানীয় লোকদের সম্পৃক্ত করা হলে নিজেদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ বাড়বে এবং ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার উন্নতি হবে।

গ্রামের লোকেরা নিজেদের স্কুল ভবন নিজেরা তৈরি করার ফলে যে অর্থ সাশ্রয় হবে সে অর্থ দিয়ে অনেক বেশি শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হবে। তাছাড়া প্রতিটি জেলায় এমনকি গুরুত্বপূর্ণ থানাগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য ট্রেনিং ইন্সটিটিউট স্থাপনের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যেতে পারে। সব প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রশিক্ষণ পেলে শিক্ষার গুণগত-মান যে বাড়বে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এভাবে সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের এক বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং বর্তমানে শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে হতাশা থেকে বিপথগামী হওয়ার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে তা অনেকাংশে কমে যাবে।

আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ লোকই খুবই গরিব, ভূমিহীন। ফলে তারা ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও ছেলেমেয়েদের স্কুলে না পাঠিয়ে শহরে ধনীদের বাসায় কাজ করতে অথবা গ্রামের গৃহস্থ ঘরের গরু ছাগল দেখাশুনা করার জন্য কাজে দেয়। এর ফলে তারা দু'ভাবে লাভবান হয় প্রথমত খাওয়া-পরার দায়িত্ব থাকে না এবং দ্বিতীয়ত বেতনের মাধ্যমে মাসিক বা বাৎসরিকভাবে কিছুটা আয় হয়। একারণে এসব ছেলেমেয়ে যেন স্কুলে যেতে পারে, এজন্য সরকার যদি স্কুলগামীদের জন্য Food aid বা মাসে মাসে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে তাহলে গরিব বাবা-মায়েরা তাদের ছেলে-মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে উৎসাহিত হবে। এছাড়া বছরশেষে স্কুলগামী ছেলেমেয়েদের একসেট কাপড় কেনার জন্য যদি কিছু টাকা দেয়া হয় তাহলে ছেলেমেয়েরাও স্কুলে যাওয়ার জন্য আরো বেশি উদ্বুদ্ধ হবে।

[ এস,এস চাকমা, অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব ]

তারিখ ... 18 MAR 1997 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...